মাধবীদের ঈশ্বর—৮

নন্দিনী হোসেন

অনেক দিনের যত্নে রাখা চশমাটা আজই ভেঙ্গে গেলো। যাক। অনেক দিন তো হলো। আর কত? একজীবনে কতই না উত্তান পতন ঘটে মানুষের জীবনে। মানুষই থাকে না। আর এ তো এক চশমা! চেয়ারে বসে কড়ে আঙ্গুলে দিন মাস বছর গুনেন আনোয়ারা। বার বার ভুল হয়ে যায়।

সঠিক হিসেব হচ্ছে না বুঝতে পেরে এক সময় ডাকেন নাতীকে,

একটু হিসেব করে দাও তো ভাই ।

ক্লাস থ্রীতে পড়ুয়া ফাহিম এসেই নানী কে তাড়া লাগায়। তার এত সব কথা শুনার সময় নেই।

কি হিসাব নানু ?

একটা মোড়া দেখিয়ে বলেন,

তুমি স্থির হয়ে বস । আমার একটা হিসেব করে দাও। খালি ভূল হচ্ছে আমার।

ওহ নানু ! কাল দেই? আমার তো সময় নেই এখন। ক্রিকেট খেলতে যাবো বন্দ্ধুদের সাথে । ওরা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য ।

যাবে ? আচ্ছা এখন তা হলে যাও। রাতে কিন্তু হিসেব টা করে দিতে হবে, মনে রেখো ।

ফাহিম চকাস করে আনোয়ারা বেগমের গালে একটা চুমু খেয়ে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলে যায়। আনোয়ারা বেগম স্থির চোঁখে তাকিয়ে তাকেন। ফাহিম টা ও কত বড় হয়ে গেলো !এই টুকুনি ছেলে ,তার ও এখন কত তাড়া ...।

তাড়া নেই কেবল তার নিজের ই। সব ব্যস্তুতা,কোলাহল কমে এসেছে। কিন্তু মনের ভিতরের অশান্তি তো তাতে কমে নি এত টুকু ও । ওখানে সারাক্ষন ই কোলাহল চলে, কেউ সেটা দেখতে পায় না !কাউকে দেখানোর নেই ও.....।

কথা গুলো ভাবতে ভাবতে এবার অন্য একটা হিসেব নিয়ে বসেন আনোয়ারা। এই হয়ছে জ্বালা। একটার পর একটা হিসেব করতে করতেই দিন পার করেন এখন। একটা ছাড়েন তো আরেকটা ধরেন। কোন টাকা পয়সা সয় সম্পত্তির হিসেব নয়। সময়ের হিসেব। বড় আজব জিনিষ এই সময়ের হিসেব। বড় মেয়ে কোন সালে জন্মেছিল ,নিজের বিয়ের বয়সই বা কত হলো,এ সবেরই হিসেব। একবার তার মনে হয় সময়টা কমে যাচ্ছে। আরেকবার মনে হয় বেড়ে যাচ্ছে। হিসেব টা ঠিক মনঃপুত হয় না তাই। একটা ভয় ও পেয়ে বসেছে ইদানীং। কেবল ই মনে হচ্ছে তিনি বুঝি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলবেন সম্পুর্ণভাবে!এখন ই তিনি অনেক কিছুই মনে করতে পারেন না। নাম,দিন ,তারিখ ভুলে যান। তিনি শুনেছেন তার নানী এবং এক খালার এই রোগ ছিল। খালার

বয়স তেমন বেশী ছিল না। চল্লিশ পার হতে না হতেই তিনি পুরোপুরি স্মৃতিভ্রষ্ট হোন। নানীর ব্যাপারটা ছিল আর ও জটিল। তিনি যে কোন ঘটনাতে একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়লেই কেমন এলোমেলো হয়ে পরতেন। প্রলাপ বকতেন। দু,তিন দিন ধরে চলত তার এ প্রলাপ বকা। তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যেতেন। চুপচাপ অবস্থায় টু শব্দ টি ও করতেন না। এ রকম কয়েক দিন কাটিয়ে আবার সম্পুর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যেতেন নিজে থেকেই। তখন আবার তার আগের কথা কিছুই মনে থাকত না !

আনোয়ারা বেগমের ও দিন দিন বদ্ধমূল ধারণা জন্মাচ্ছে তার ও এই ধরনের কিছু একটা হবে। আগে তিনি মুখে মুখে অনেক বড় বড় যোগ বিয়োগ করে ফেলতে পারতেন কয়েক সেকেন্ডে। কত প্রশংসা বাক্য শুনেছেন এক সময় এই গুণের কারণে । নদীর বাবা প্রায়ই এসে ধরতেন,

আমার এই হিসেব টা ঝটপট করে দাও তো !

ঘুরে ফিরে এতকাল পর ও বহু চর্বনে বিবর্ণ প্রায় এই সব কথা নিয়ে মনের গোপন কুঠোরী তে নাড়া চাড়া করেন আনোয়ারা। একাকী। নিজের জীবন মানুষের কাছে হয়ত কখন ও পুরোনো হয় না । আনোয়ারা বেগমের এখন সময় অসময় বলে কিছু নেই। যখন তখন হিসেবের ঝাঁপি নিয়ে বসেন। অদ্ভুত সব হিসেব। নিজে নিজে সাজান,আবার নিজেই ভাঙ্গেন। একটা বিষয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মেয়েটা মনে হয় নতুন দেশে গিয়ে ভালোই আছে। চিঠি যখন পান,কতবার যে পড়েন। উলটে পালটে খাম,হাতের লেখা এসব খুটিনাটি বিষয় গুলো অসংখ্য বার দেখেন। এক একটা চিঠি মুখস্থ হয়ে যায়। নতুন আরেকটা চিঠি না আসা পর্যন্ত আগের টি বালিশের নীচেই রাখেন। ফাহিম ঘুমিয়ে গেলে পড়েন। মাঝে মাঝে চিঠি বের করে শুধুই তাকিয়ে থাকেন।

চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। ঘুমাতে পারে বটে মেয়ে টা। আদুরে সুখি সুখি ভাব সব সময় চোঁখে মুখে লেপ্টে থাকে । কাজের মেয়েটা বাড়ি গেছে ছুটি নিয়ে আজ তিন দিন। আনোয়ারা চেয়ার ছেড়ে উঠেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়ের ঘরে উঁকি মারেন। স্কুল থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়েই লম্বা ঘুম দেয় মেয়ে। ডাক তে মায়া হয়। ফ্লাস্কে চা থাকে রোজ ই। ইচ্ছে মত ঢেলে নেন কাপে। আজ ফুরিয়ে গেছে। পাশের বাসার রুনীর মা বেড়াতে এসেছিলেন। আজকাল কেউ প্রায় আসেই না। তার বয়সী যারা আছেন,তাদের দু একজন ছাড়া প্রায় সবার ই সংসারে একটা না একটা ঝামেলা লেগে আছে। বয়স ও হচ্ছে সবার। কেউ আর আগের মত একত্রিত হতে পারেন না।

পাঁচ ছয় বছর আগে ও বিকালে কারো না কারো বাসায় যে আড্ডা টা হত,কখন যে তা অনিয়মিত হতে হতে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে তা তেমন করে খেয়াল করেন নি আনোয়ারা। কয়েক জনের সাথে আনোয়ারা বেগমের ঘনিষ্টতা শৈশব কাল থেকে। তাদের ই কেউ কেউ এখন ও মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিতে আসেন । এই যেমন রুনীর মা। অনেক দিন পর আজ দেখা হলো। সুখ দুঃখের নানা কথা বলতে বলতে কখন যে চা ফুরিয়ে গেছে খেয়াল করেন নি।

জামাই ফেরে স ন্ধা প্রায় পার করে দিয়ে। আনোয়ারা বেগম গজ গজ করেন কাজের মেয়ের উদ্দেশ্যে। দুই দিনের নাম করে তিন দিন যায়,কোন খবর নেই । তিন দিন তো নয় যেন তিন মাস। রান্না বান্না তো দুরের কথা ,অনেক দিন তিনি চুলোর ধারেই যান না । শরীর যেভাবে স্থুল হচ্ছে দিন দিন সামান্য কাজ ও এখন আর গুছিয়ে করতে পারেন না ।

কোথায় কি থাকে না থাকে হাজারবার দেখলে ও মনে থাকে না। জিনিষ পত্র একটা খুঁজে পেলে আরেকটা পান না। স্কুলে যাবার আগে মেয়েটা এক ভাত তরকারী রান্না করে ফ্রিজে রেখে যায়। এই

চলছে আজ তিন দিন ধরে। আর ও কদিন চলবে কে জানে ....।

খানিক্ষন বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। আরেকটু পর ই মাগরিবের আজান হবে। নিজের রুমের দিকে যেতে যেতে মনে হয় মেয়ে কে এবার ডেকে তোলা দরকার। মেয়েটার একেবারেই নামাজ কালামে মতি নেই। মাগরিবের সময় কেউ ঘুমায় ! বিরক্তি চেপে রাখতে পারেন না আনোয়ারা । মেয়ের রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকেন,

নাদিয়া ! মাগরিবের আজান হবে এক্ষুনই, কি সব অলুক্ষনে কান্ড ! এখন উঠ ,আবার ঘুমাস পরে ...।

নাদিয়া ঘুম জড়ানো কন্ঠে উত্তর দেয়,

মাগরিবের সময় হয়ে গেছে ? ধুর ! এই না ঘুমালাম...।

এই কোথায় ? অনেকক্ষন ঘুমিয়েছিস। দেখ আয়নায় , তোর চোঁখ মুখ ফুলে আছে । ফাহিম এখন ও তো ফিরল না। একটা ফোন কর। পড়তে বসবে না?

মেয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বিছানায় উঠে বসে।

আনোয়ারা নিজের রুমের দিকে যেতে যেতে বলেন। চশমা টা ভেঙ্গে গেছে। চিঠির উত্তর লিখব ভাবছিলাম আজ,আর আজ ই ভেঙ্গে গেল ! মনের এক রাশ বিরক্তি যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। কেমন বিতৃষ্ণা লাগছে সব কিছুতে। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। অল্প কিছুতেই শরীর মনে অদ্ভুত এক অবসাদে ছেয়ে যায়। একবার হলে সহজে তা যেতে চায় না। মাথার ভিতর কিলবিল করে নানা জাতের পোকা....!

নামাজ পড়ে বিছানায় বসে তসবী টিপেন আনোয়ারা, কিন্তু মন যেন কিছুতেই বসছে না । বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। এক জায়গায় জড়ো করে সুস্থির হতে পারছেন না। বিছানা ছেড়ে আবার বারান্দায় যান। এ মাথা ও মাথা হাঁটেন। বেশী ক্ষণ হাটঁতেও পারেন না আজকাল। হাঁপিয়ে উঠেন। কিছুক্ষন পর পর ই বসে জিরোতে হয়। বারান্দায় বেতের ক'টি গদি আটাঁ চেয়ার পাতা আছে। একটি ছোট্ট টেবিল মাঝখানে। তাতে কিছু পত্রিকা ম্যাগাজিন পরে থাকে। পুরানো ই বেশীর ভাগ। নতুন ম্যাগাজিন কিছু পরে থাকার জো নেই। ছোঁ মেরে নিয়ে যায় মেয়ে। এক সময় তিনি বেগম পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তা থেকে সেলাই রান্না সহ ঘরকন্নার কত কিছু শিখেছেন। গল্প উপন্যাস ও পড়তেন গোগ্রাসে। সাহস করে দু 'একটি কবিতাও পাঠিয়েছিলেন বেগম পত্রিকায়। অবশ্য নিজের নাম গোপন করে। ইচ্ছা ছিল ছাপার অক্ষরে তা বের হলে ঘরের মানুষ কে জানাবেন। কিন্তু আনোয়ারা বেগমের সে আশা পূরণ হয় নি । তাঁর বদ্ধমূল ধারণা কবিতা গুলো এমন কিছু খারাপ ছিল না। হয়ত কোন এক কারণে কতৃপক্ষের হাত পর্যন্ত সেগুলো পৌঁছায় নি !ঢাকায় গেলে কখন ও কখন ও ইচ্ছা ছাগা দিয়ে উঠত মনে , পত্রিকা অফিসে নিজে গিয়ে কবিতা গুলো আবার দিয়ে আসবেন। আর ও একটা গোপন ইচ্ছা ছিল,সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম কে সচক্ষে এক বার দেখা। কিন্তু সে ইচ্ছা কখন ও কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। কত ছোট খাট ইচ্ছা যে জীবনে প্রকাশ করতে পারেন নি । নিজের ভিতর ইচ্ছার বুদ বুদ গুলো দেখা দিয়ে ,কিছুদিন বসবাস করে আপনিতেই মরে গেছে ....।

মৃদু বাতাসে গাছ-পালা,লতা পাতা থেকে হাল্কা একটা ঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই গন্ধ টা তার খুব প্রিয়। নাদিয়ার সাথে এক দিন সন্ধার পর বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন,তখন এই গাছ পালার গন্ধ টা নাকে এসে লাগলে মেয়েকে বলেছিলেন

গাছ পালার এই গন্ধ টা আমাকে শৈশব থেকেই কেন যেন মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয় !গন্ধ টার মধ্যে কেমন একটা মা মা গন্ধ আছে , না ?

নাদিয়া ভ্রু কূঁচকে তাকায়।

গাছ পালার গন্ধ ? সেটা আবার কেমন মা?

কেন, তুই কোন গন্ধ পাচ্ছিস না?

নাহ তো !কেমন গন্ধ ?

থাক ,বাদ দে !পাস না যখন,তখন আর কি করে বোঝাব ।

নাদিয়া আবার বলে,

নানীর সাথে এই গন্ধের কি সম্পর্ক ?

কোন সম্পর্ক নেই ! কেন মনে পরে তা তো বলতে পারব না। তবে পরে। মার চেহারা কেমন তা আমি দেখি নি। কোন ছবি টবি ও ছিল না যে দেখব। মানুষের মুখ থেকে শুনেছি তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন......।

একটু থেমে বলেন মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানিস,মা যেন আমাকে দেখতে পান ।আমি তাকে অনুভব করতে পারি ।

কি করে অনুভব করো !

আনোয়ারা আর কোন কথা বলেন না। চুপ করে থাকেন। বুক ভরে শ্বাস নেন।

নাদিয়া বাঁচ্চা শিশুর মত মা'র গলা জড়িয়ে ধরে। গালে নাক ঘষতে ঘষতে বলে,

মা তোমার খুব কষ্ট না ....?

ফাহিম পাঁ টিপে টিপে এসে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে জোরে শব্দ করে বলে,

নানু এখানে কি কর ? চল ঘরে চল।

আনোয়ারা ফাহিমের আকস্মিক পিছন থেকে জড়িয়ে ধরায় কেঁপে উঠেন।

তুমি ফিরেছ কখন ? একটু ও টের পাই নি তো !

পাবে কি করে ? একলা একলা কথা বলো সারাক্ষণ !

তাই নাকি ? একলা কথা বলি ? এখন কি তাই বলছিলাম ?

আমি তো সব সময় দেখি তুমি একলা কথা বলো !আচ্ছা নানু তুমি কি কাউকে দেখ ?

হেসে ফেলেন আনোয়ারা।

নাহ তো নানু। কাউকে তো দেখি না !আসলে নিজের সাথেই কথা বলি ,বুঝছো ?
যাও পড়তে বস গিয়ে। আমি পরে আসছি। মা কি করছে রে?

মা ফোনে কথা বলে। প্লীজ নানু আস । পড়া না পারলেই মা খালি বকা দেয়। তুমি আস। আমি তোমার কাছে পড়ব ।

তোমার না টিচার আসার কথা ?

আজ আসবেন না। কাল বলে গেছেন।

ওহ। আচ্ছা যাও,আমি আসছি।

ফাহিম নাচতে নাচতে ফিরে যায় । আনোয়ারা আবার বুক ভরে গাছ লতা পাতার গন্ধ নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই ঘ্রাণ টা যেন আর ফিরে আসে না বুকের ভিতর ।

রাতে ফাহিম ঘুমিয়ে গেলে নদীর চিঠি টা আবার বের করেন। বুক টা হু হু করে উঠে। মেয়ে টা একটা ফোন ও তো করতে পারত । কেন যে করে না....!

কত মানুষের ছেলে মেয়েই তো বিদেশে থাকে,তারা এমন করে ? সবাই তো যখন সুবিধা আসছে যাচ্ছে । ফোন করছে। কথা বলছে....।

নাদিয়া কে বলেছিলেন চিঠি তে নদী কে লিখতে তার নতুন ফোন নাম্বার টা দেওয়ার জন্য। নাদিয়া তা লিখে নি। বলতেই রাগ রাগ চোঁখে তাকিয়েছিল। আসলে কিছু না বললেও আনোয়ারা বোঝেন তার মধ্যে বোনের প্রতি আছে এক প্রচন্ড অভিমান । আগে তিনি কখন ও কখন ও বোঝাতেন,এখন আর কিছু বলেন না। কি ই বা বলবেন আর,কত ই বা বলবেন ।

দুই বোনের বয়সের ব্যব ধান ও অনেক। প্রায় নয় দশ বছরের। আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠার তেমন সুযোগই ঘটে নি। নদী সব সময় ই চুপচাপ থাকত। নাদিয়া বরং ছিল উলটো। এক বছর বয়স পর্যন্ত রাতে প্রায় ঘুমাতই না। কোলে নিয়ে হাঁট তে হত সারা রাত। বসলেই কাঁন্না । কি যে জালিয়েছে মেয়েটা।

খুব কষ্ট গেছে সে সময় আনোয়ারা বেগমের উপর দিয়ে। রাতে দু’তিন ঘন্টা ও তার ঘুমানোর সুযোগ হয় নি দীর্ঘ দিন। দিনে ও সংসারের কাজ আর নাদিয়া কে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত সারাক্ষণ। নদীর তখন দশ এগারো মাত্র বয়স। মেয়ে টা প্রায় তার অলক্ষেই বড় হচ্ছিল। মা হিসেবে তার তেমন কোন মনোযোগ পায় নি। এমনিতেই চুপ চাপ। আর ও যেন নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন।

আনোয়ারা বেগমের ইদানীং প্রায়ই মনে হয়, তখনই হয়ত তিনি মারাত্বক ভুল টা করেছিলেন। যদি শান্ত বলে মেয়ে টাকে একদম একা ছেড়ে না দিয়ে, সামান্য খোঁজ খবর রাখতেন, তাহলে হয়ত অবস্থা পরে এতটা খারাপ হত না। বুক টা ভেঙ্গে আসে এসব কথা ভাবলে। এখন শত চেষ্টা করে ও সেই দিন গুলো ফিরিয়ে আনা যাবে না। ক্ষমতা থাকলে তিনি জীবন থেকে স্বল্প সময়ের সেই গ্রামীন জীবন কে মুছে দিতেন !তখনকার তার গ্রামে বাস করার সিদ্ধান্ত কি মারাত্বক ভুলই না ছিল। তখন যদি এত টুকু বূঝতেন ,তাহলে হয়ত তার পরিবারের গতিপথ আজ অন্য ধারায় বইত।

বরং তিনি তখন উলটো ভুল ভাবতেন । মেয়ে টা কত লক্ষী,কাউকে কোন ভাবে বিরক্ত করে না,যা করার নিজে নিজেই সব করে নেয়। নিজেকে ভাগ্যবান ই মনে করতেন । মেয়েটার জন্য বাড়তি কোন সময় দিতে হয় না বা তার কোন আবদার পোহাতে হয় না। হায়রে !তিনি যদি মেয়ের মনের জটিলতা টা একটু ও ধরতে পারতেন !

আত্বীয়-স্বজন সবাই নদীর খুব প্রশংসা করত। বলত আপনার বড় মেয়েটা খুব লক্ষী !কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল নদী কারো সামনেই তেমন আর বের হচ্ছে না। হয় দেখা যায় মুখ গুজে পড়ছে অথবা চুপ করে শুয়ে আছে। খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করছে না। তিনি ভেবেছিলেন তার শান্ত মেয়ে ,লক্ষী মেয়ে বড় হচ্ছে,তাই মেয়ের সাময়িক এই পরিবর্তন । সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তার নিজের এই সময় টার কথা মনে পরে। তার নিজের তো মা ও ছিলেন না । ভাইরা ছিল বড়। নিজেদের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। বাবা ও তেমনি। তার আদর আহ্লাদ সব ই ছিল তাদের কাছে। তবু তিনি একাকী ছিলেন। বান্ধবীরা ছিল তার প্রাণ। তারপর ও কেন যে থেকে থেকেই সব কেমন খালি খালি লাগত ......।

তখন তিনি ও মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পরতেন। কখন ও খুব ই চুপচাপ হয়ে যেতেন। কারো সামনে বের হতে ইচ্ছে করত না। মেয়ের ব্যাপার টা ও তিনি তেমনি কিছু ভেবে তেমন একটা পাত্তা দেননি । সেই রাত টার কথা এত কাল পর ও জ্বলজ্বল করে বেচে আছে মনের ভিতর......।

সেদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে কি মনে করে মেয়ের রুমের দিকে উঁকি মেরে দেখেন ঘর অন্ধকার। ভাবেন নদী বুঝি ঘুমিয়ে পরেছে। চুপি চুপি ফিরে যাচ্ছিলেন। শুনেন মেয়ে ডাকছে,

মা !একটু আসবে?

আনোয়ারা বেগম সামান্য অবাক হন ।

কি হয়েছে নদী? গলা এমন কেন? শরীর খারাপ?

আনোয়ারা মেয়ের পাশে বসেন। হাত বুলিয়ে দেন মাথায়। কপালে হাত রাখতে গেলে নদী সরিয়ে দেয় সে হাত। বিছানায় উঠে বসে। রুম তখন ও অন্ধকার। আনোয়ারা বলেন,

আলোটা জ্বালিয়ে দেই ,দাঁড়া ।

দরকার নেই। থাক।

থাক তাহলে । কিছু বলবি ?

মা ! মাধবীকে তোমার মনে পরে ?

আনোয়ারা বেগম প্রথম ক'মুহূর্ত্য ভেবে পান না মাধবী টা আবার কে !পর মুহূর্ত্যে মনে পরে যেতেই তার শিঁরদাড়া বেয়ে অদ্ভুত এক শীতল অনুভুতি নীচের দিকে যেন শির শির করে নেমে যায়।

মা ! মাধবীর কি হয়েছিল ?

মেয়ের খস খসে কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে আনোয়ারা বেগম বিমুঢ় হয়ে আলো জ্বালাতে যান.....।

চলবে.........।